দুইয়ে দুইয়ে চার নয়

ডাঃ প্রদীপ্ত ঘোষ

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

"প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই রোগ হয়, এ কোন ভগবানের অভিশাপ অথবা আলৌকিক জাদুমন্ত্রের ফল নয়। চিকিৎসার অভাবে এই রোগ এক সময় এমন জায়গায় পৌঁছয় যা থেকে আর ফিরে আসা যায় না, রোগীর মৃত্যু হয়।"

যীশুর জন্মের প্রায় চারশ বছর আগের কথা। গ্রীসের ছোট্ট একটা দ্বীপ কস। সেই কস দ্বীপে ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিদ্যালয় অ্যাসক্লেপিয়ন। গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার দেবতা অ্যাসক্লেপিয়াসের নাম থেকেই এই নাম। গ্রীকরা তখনও মানুষের মারণরোগের কারণ ও তার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে চলেছে। সেখানেই পাঠরত এক যুবক প্রথম বলেন রোগ কোন কালো জাদু না অভিশাপ থেকে হয় না, প্রতিটি রোগের প্রকৃতি নির্ধারিত কারণ থাকে। তার চিকিৎসাতেই রোগমুক্তি সম্ভব।

এই একটি ধারণাই সেই সময়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আমূল বদলে দেয়। ঝাড়-ফুঁকের ওপরে বিশ্বাস আর না রেখে মানুষ শুরু করে রোগের মূল কারণের অন্বেষণ। যে যুবক এমন পৃথিবী বদলে দেওয়া কথাটি বলেছিলেন তার নাম ছিল হিপোক্রেটিস।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক।

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরে মানব জাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানও অনেক এগিয়ে গেছে। সুস্থ জীবন, অসুখ এবং মৃত্যু, এই তিনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকেরা বদ্ধপরিকর। মানবশরীর যেমন জটিল তেমনই জটিল এই শরীরে বাসা বাঁধা শত সহস্র রোগবালাই। তাদের সাথে নিরন্তর লুকোচুরি খেলা চলে বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকদের। বেশিরভাগ সময়ই বিজ্ঞান জিতেছে। তাই আজ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়েছে স্মল পক্স বা টাইপ থ্রি পোলিওর মতো মারণ রোগ। প্লেগে বা ডিপথেরিয়া এখন আর কেউ মারা যায় না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসাও অনেক এগিয়েছে। কর্কটরোগ থেকে আর আমরা ভীত নই। অনেক ক্ষেত্রেই তাকে জয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরোপুরি জেতা না গেলেও আক্রান্ত রুগীর আয়ু বাড়িয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছি আমরা।

তার মানে কি চিকিৎসকরা সর্বদাই জিতছেন?

তা কি হয়?

আমরা তো অপার শক্তিশালী ঈশ্বর নই।

মৃত্যুই অমোঘ সত্যি। মানবজীবনের শেষ পরিণতি। চিকিৎসকের এই মৃত্যু থেকে জীবনের দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করেন মাত্র। কখনও কখনও মৃত্যুরও জয় হয়। আজও এমন বহু রোগ আছে যা অবাক করে আমাদের। প্রতিনিয়ত এমন নতুন নতুন রোগের সুলুকসন্ধানে রত রয়েছেন বিশ্ব জুড়ে কয়েক লক্ষ বিজ্ঞানী।

কোন রোগের লক্ষণ বা সিম্পটম থেকে তাকে খুঁজে বার করার মধ্যে ডিটেকটিভ গল্পের তুলনায় কোন অংশে উত্তেজনা কম নেই! বহুবছর প্র্যাকটিস করার পরেও কোন এক জটিল রোগ পোড় খাওয়া ডাক্তারকেও অবাক করে। সেই রোগকে খুঁজে বার করে রুগীর কষ্টের উপশমের মধ্যে যে স্বর্গীয় আনন্দ আছে তা একজন ডাক্তারই অনুভব করতে পারেন। আবার রোগের লক্ষণ দেখেই যে সরাসরি রোগ চিনে ফেলা যাবে এমনও হয় না অনেক ক্ষেত্রে।

সবসময় তো আর দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না।

আমি নিজে একজন চিকিৎসক। গত দশ বছর ধরে এই পেশায় নিয়োজিত। এই বইয়ের লেখক ডাঃ প্রদীপ্ত ঘোষ আমার সহৃদয় বন্ধু। সদ্য স্কুল থেকে বেরিয়েই আঠারো বছর বয়সে আমরা একসঙ্গে ডাক্তারির পাঠ নিতে ঢুকেছিলাম কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে। সেখানে কাটিয়েছি ছয়টা সোনার বছর। একসঙ্গে পড়াশোনা, বাড়ি ফেরা, খাওয়া দাওয়া, রুগী দেখা, রাত জাগা, আরো কত কী। ডাক্তার প্রদীপ্তর থেকেও মানুষ প্রদীপ্তকে আমি অনেক কাছ থেকে চিনি। এমন সংবেদনশীল মন খুব কমই দেখেছি এই ছোট জীবনে।

প্রদীপ্ত বর্তমানে একজন সদা ব্যস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সেই প্রদীপ্ত যখন বলে ওর ডাক্তারির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখতে চায় তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম প্রদীপ্তর মত একজন ডাক্তার তার অভিজ্ঞতা নিয়ে কলম ধরলে তা পাঠকসমাজে কী বার্তা, কী উপহার আনতে চলেছে। ডাক্তারি জ্ঞানের কচকচি নয়,তার সাথে জারিত হওয়া মানব জীবনকথার এক একটি ছবি এই বইতে থাকা এক একটি গল্প। পাঠক যখন বইটা পড়বেন তখন এই গল্পগুলো তাকে ভাবাবে, নতুন করে চেনাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে। ছোট জানলার ফাঁক দিয়ে এই বিজ্ঞানের অপরিসীম আকাশের এক টুকরো ধরা দেবে তার মননে।

এমন একটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে পেরে আমি যারপরনাই গর্বিত বোধ করছি। সাহিত্যের এই ধারাটি বাংলা ভাষায় ভীষণই অপ্রতুল। প্রদীপ্তর হাত ধরেই এর জয়যাত্রার শুরু হোক এবং তা অব্যাহত থাকুক।

অনির্বাণ ঘোষ

সূচিপত্র

নীল মানুষ	১১
পেটে নয়, বুকে	২১
মহীনবাবুর রোগ	২৭
হাত বেহাত	৩৪
সাপ আর লাঠি	৪৩
স্টেথোস্কোপ	৪৯
বিড়ি বারণ	৫৫
নাসিকা বিভ্রাট	৬০
আমার চোখে আমি	৭৪
খগেনের ওষুধ	৮৩
সমুদ্রে আতঙ্ক	৯৪
এ কেমন কান্না	১০২
আলোর থেকে দূরে	১১৬
খাই খাই	১২২
এরকমও হয়	১২৮
ভূতুড়ে হাত	১৩৮
নিজের চোখে দেখা	১৪৬
মেয়ে ডাক্তার	১৫১
নিয়তি	১৫৬
পাথরেও ফোটে ফুল	১৬২

"এ কী! বেবি এত নীল কেন?" সদ্যোজাত বাচ্চাটাকে দেখে আঁতকে উঠলেন লেবার রুমের প্রধান সিস্টার।

"ডক্টর, বেবি ইজ ব্লু।" সিস্টার হাঁক পাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন হইচই বেঁধে গেল হাসপাতালের লেবার রুমে। কেন্টাকির হ্যাজার্ডে একটা ছোট্ট হাসপাতালের লেবার রুমের বাইরে তখন অপেক্ষা করছে স্ট্যাসি পরিবারের সদস্যরা। আলভা স্ট্যাসি উত্তেজনায় ছটফট করছেন, কখন লেবার রুমের ভিতর থেকে সুখবর আসে, তিনি বাবা হয়েছেন! আলভার সঙ্গে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। পরিবারের নবতম সদস্যকে দেখবার জন্য বৃদ্ধার মনটাও ছটফট করছে।

লেবার রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সিস্টার। আলভাকে ইশারায় ডাকলেন।

"মিস্টার আলভা, আপনার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু..." কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন সিস্টার।

"কিন্তু কী?" আলভা জিজ্ঞেস করলেন।

"বাচ্চার লক্ষণ আমাদের খুব একটা ভালো লাগছে না। মা যদিও ভালোই আছে। কিন্তু, বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। আমাদের হাসপাতালের পুরো মেডিক্যাল টিম লেবার রুমে আছে। আপনারা ধৈর্য ধরে এখানে অপেক্ষা করুন। পরবর্তীতে কী করা হবে আমরা জানাচ্ছি।"

"সমস্যাটা কী?" সবে মাত্র বাবা হওয়া আলভার গলায় উদ্বেগ স্বাভাবিক। "সংকট জনক কিছু? খুব খারাপ কিছু নয়তো সিস্টার ?"

"আশা করছি, খুব খারাপ কিছু হবে না। তবে সবকিছুই তো আমাদের হাতে থাকে না মিস্টার আলভা। ঈশ্বরকে ডাকুন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।" লেবার রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন সিস্টার।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন আলভা। বৃদ্ধার পাশে এসে বসলেন। "কী হয়েছে?" বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন। আলভার ম্লান মুখ দেখে খারাপ কিছু আন্দাজ

করেছেন।

"ছেলে হয়েছে। কিন্তু, বাচ্চাটা নাকি ভাল নেই। তবে মায়ের শরীর ঠিক আছে।"

লেবার রুমের ভিতরে তখন সাজো সাজো রব। এই ন্যুনতম সুযোগ সুবিধার ছোট্ট হাসপাতালে বাচ্চাটাকে রাখা নিরাপদ নয়। একদম নীল একটা বাচ্চা! হার্ট বা ফুসফুসের বড় কোন সমস্যা হতে পারে। যদিও বা গায়ের রঙ ছাড়া আপাতত অন্য কোনও উপসর্গ নেই, কিন্তু নীল রঙ মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। যে কোনও সময় এমার্জেন্সি অবস্থা তৈরি হতে পারে, তখন আর সামাল দেওয়া যাবে না। তাই সকলে মিলে স্থির করলেন,এখানে এই বাচ্চাকে কিছুতেই রাখা যাবে না। একে পাঠাতে হবে অন্য কোনও বড় হাসপাতালে। এমন হাসপাতাল, যেখানে যে কোনও বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব।

আবার বাইরে এলেন সিস্টার। বাইরে অপেক্ষারত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আলভা স্ট্যাসি। সিস্টারকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন আলভা।

"মিঃ আলভা। আমরা বাচ্চাকে এখানে রাখব না। বাচ্চা এখনও অবধি বিপদের বাইরে, কিন্তু সিনিয়র চিকিৎসকরা মনে করছেন যখন তখন বিপদ আসতে পারে। এই হাসপাতালে পরিস্থিতি সামলে ওঠা মুশকিল হতে পারে। তাই হাতে সময় থাকতে থাকতেই আমরা বেবিকে বড় কোনও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে চাই।"

"হয়েছেটা কী?" আলভা জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনার বাচ্চা জন্মের পর থেকেই নীল। বেশ নীল। হাত পায়ের আঙুল, তালু, ঠোঁট সমস্তটাই নীল। শরীরের বাকি অংশও যথেষ্ট নীল। মনে হচ্ছে, এটা জটিল কোনও রোগের লক্ষণ। বাচ্চার হার্ট বা লাংসের জন্মগত কোনও ত্রুটি থাকতে পারে। সঠিক ইনভেস্টিগেশন করে সঠিক চিকিৎসা করলে বিপদের আশংকা কম।" সিস্টার আলভাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন।

আলভা ফিরে এলেন বৃদ্ধার কাছে। "এরা বাচ্চাকে এই হাসপাতালে রাখবে না। অন্য কোনও বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?" বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন আলভাকে। তাঁর মনেও তখন নানা আশঙ্কা ভিড় করছে।

"বলছেন, বাচ্চা পুরো নীল হয়ে জন্মেছে! হার্ট বা লাংসের সমস্যা থাকলে নাকি এরকম হতে পারে। তাই আরও ভাল কোনও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসা করা প্রয়োজন।"

"নীল? গায়ের রঙ নীল?" অবাক চোখে আলভাকে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধা।

হ্যাজার্ডের ছোট্ট হাসপাতাল থেকে রওনা দিল একটা অ্যাম্বুলেন্স। গন্তব্য লেক্সিংটনের একটা বড় হাসপাতাল। সেখানেই হয়তো সদ্যোজাত নীল শিশুর সঠিক চিকিৎসা হতে পারে। এম্বুলেন্সের সঙ্গে রয়েছেন হাসপাতালের স্টাফরা আর সদ্যোজাত বেঞ্জামিন স্ট্যাসি। পিছন পিছন রওনা দিলেন আলভা আর

পেটে নয় বুকে

"এই কী হল? বমি করলে কেন হঠাৎ?" অনীশকে ধরে নিয়ে খাটে বসাল পিয়ালী।

"হঠাৎ করে গুলিয়ে উঠল গা'টা। কেন কে জানে?"

"সেরকম তো কিছু খাওয়া হয়নি আজকে। শরীর খারাপ লাগলে আজ আর অফিস যেও না। ট্রেনে তো আবার মারামারি করা ভিড়," পিয়ালী বলল।

"তোমার তো একটা কিছু হলেই হল। মামাবাড়ির আবদার তো। একবার বমি হয়েছে বলে আসিনি, এই শুনলে বস বলবে, কাল থেকে বমি করুন ঘরে বসে, আপনাকে আর আসতে হবে না। বমিটা করে এখন এমনিতেও হালকা লাগছে," জলের বোতলটা খুলে গলায় ঢালল অনীশ, "এলাম।"

"সাবধানে যেও," হাত নেড়ে বিদায় জানাল পিয়ালী। অফিসের উদ্দেশে রওনা হল অনীশ।

কিন্তু, আজকের বমিটাই প্রথম নয়। গতকালও অফিসে পৌঁছে বমি করেছিল ও। সপ্তাহ খানেক ধরেই কেমন একটা গা গোলানো ভাব লক্ষ করছে অনীশ। পিয়ালীকে জানানোটা ঠিক মনে করেনি ও, তাই এড়িয়েই গেছে। পিয়ালীর এখন দু'মাস চলছে, কোনওরকম টেনশন এই সময় ও পিয়ালীকে দিতে চায় না। বিয়ের সাত বছর পর, এই প্রথমবার পিয়ালী প্রেগন্যান্ট হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, এটা হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি। পিয়ালীকে তাই যতটা সম্ভব মানসিক ভাবে হালকা রাখতে চায় অনীশ।

দিন সাতেক পরে আবার। জাস্ট বাড়ির গেট থেকে বেরোনোর মুখেই গা'টা কেমন গুলিয়ে উঠল অনীশের। ঘরে ঢুকে বমি করল।

"এই তোমার কী হয়েছে বলো তো? তুমি কিন্তু আজই ডাক্তারের কাছে যাবে। আজকে কিছুতেই অফিস যাবে না তুমি, যে যাই বলুক," জেদ ধরে বসল পিয়ালী।

"তোমার বমি হচ্ছে, তাই আমারও হয়তো হচ্ছে। একেই বলে প্রেম, বুঝলে?" হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চাইল অনীশ।

তবে গত কিছুদিন ধরে অনীশের শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না, সেটা

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। খুব গ্যাস হচ্ছে, সঙ্গে বদহজম আর অ্যাসিডিটি। অফিসে গিয়েই গা যেন এলিয়ে পড়ছে ওর। ঘুমটাও ঠিকঠাক হচ্ছে না। একজন ডাক্তারকে যে দেখানো দরকার, সেটা অনীশ নিজেও বুঝতে পারছে। ওর সামনে এখন অনেক দায়িত্ব। অনাগত ভবিষ্যৎকে লালন পালনের ভার!

অফিস থেকে সময় বার করে, এক চিকিৎসকের কাছে গেল অনীশ। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল ও। এতদিন ধরে যা যা হচ্ছে সব। ওকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন ডক্টর। দুটো ওষুধ আর প্রয়োজনীয় কয়েকটা টেস্ট লিখে দিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সবকটা টেস্ট করিয়ে ফেলল অনীশ। সব রিপোর্টই একদম নর্ম্যাল বের হল। তবে ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে অনীশের বমি ভাবটা কমেছে। কিন্তু ক্লান্ত ভাবটা কাটেনি। এর সঙ্গে একটা নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। পিঠে ব্যথা ব্যথা অনুভব করছে অনীশ। ইদানীং আবার ঘন ঘন টয়লেটেও যেতে হচ্ছে ওকে।

সময় বড় পিচ্ছিল। খুব দ্রুত কেটে যায়। দেখতে দেখতে পিয়ালীর ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার চেক-আপ করে বলেছেন, এখনও অবধি অল পারফেক্ট। অনীশ আর পিয়ালী তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত। তবে অনীশের জন্য পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হতে পারছে না ওরা।

"তুমি এখন শুধু নিজের যত্ন নাও। আমার এইগুলো কেটে যাবে। সাময়িক এরকম অনেক সময় হয়। কাজের চাপও তো বেশি, তার জন্যও হয় অনেক সময়। ওষুধ তো খাচ্ছিই, আগের চেয়ে একটু ভালোও আছি। সবরকম টেস্ট হল, সেগুলোর রিপোর্টও একদম নর্ম্যাল। অতএব, তোমার ভয়ের কিছুই নেই," অনীশ বলল।

"সেটাই তো ভয়ের, রোগটা যে ধরা পড়ছে না," চিন্তিত গলায় বলল পিয়ালী।

"আরে রোগ-টোগ কিছুই নয়। কোনও কারণে শরীরটা হয়তো একটু ক্লান্ত লাগছে। ব্যস। ঠিক হয়ে যাবে।"

এদিকে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। নতুন মা হবে পিয়ালী, অনীশ হবে বাবা। ওরা দু'জনে ঠিক কতটা উত্তেজিত, সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে পিয়ালী। প্রেগন্যান্ট হলে সব মেয়েরা যেমন কিছুটা ভারী হয়। এটা যেন সর্বজনীন। মাতৃত্বের ছোঁয়া লেগেছে পিয়ালীর শরীরে। ওরা দু'জনে অবসরে বসে আগামী দিনের পরিকল্পনা করে। ওদের ভাবী সন্তানকে নিয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখে দু'জনেই। সবকিছুর মধ্যেও শুধু একটা কাঁটা খচখচ করছেই অনীশের। ও কিছুতেই ঠিক সুস্থ বোধ করছে না। বমি ভাবটা কেটে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার বদলে অনেকগুলো নতুন উপসর্গ শুরু হয়েছে। সেগুলো এমনই আজব যে, পিয়ালীকে বলতেও

"ডক্টর, একটা প্রশ্ন করি? যদিও আপনারা সায়েন্সের লোক, বিশ্বাস করবেন না জানি," চেম্বারে ঢুকেই দীপ্তকে বললেন ভদ্রলোক। দীপ্ত এলাকার একজন তরুণ ডাক্তার। কিছুদিন ধরে এলাকায় প্র্যাকটিস করছে ও। কম সময়েই ভালো পসার করে ফেলেছে। অল্প বয়সেই এই অঞ্চলের মানুষ ওকে বেশ ভরসা করতে শুরু করেছেন।

"কী প্রশ্ন বলুন?" দীপ্ত বলল।

"পাপের ফলে কি কোনও রোগ হতে পারে স্যার?"

অবাক হয়ে গেল দীপ্ত। আজকালকার আপাত আধুনিক একজন লোকের এরকম উদ্ভট একটা প্রশ্ন শুনে যে কেউই অবাক হবে। "আমার তো এরকম কিছু জানা নেই। আপনার কী সমস্যা সেটা বলুন।"

"বলছি। আসলে আমার অনেকগুলো রোগ। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব?" সঙ্গে আনা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বের করতে করতে বললেন ভদ্রলোক। "কত কাগজ দেখছেন স্যার? কেউ ধরতেও পারছে না, কেউ সারাতেও পারছে না।"

"আপনার নাম আর বয়সটা বলুন। আপনার বর্তমান অসুবিধা কী সেটা আগে বলুন।"

"মহীন দাস। বয়স বিয়াল্লিশ। প্রথম কথা হল স্যার, আমার মাথা থেকে পা অবধি জ্বালা জ্বালা করে। দ্বিতীয়ত, বুকের মধ্যে একটা আওয়াজ হয়, অলটাইম। কেউ যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। একটা ব্যথা ব্যথা ভাবও হয়। আর, তিন নম্বর হচ্ছে পেটটা একটু ভারী ভারী লাগে। আরও অনেক কিছুই আছে, তবে এগুলো ইদানীং বেশি সমস্যা করছে।"

দীপ্ত ওই একগুচ্ছ কাগজের মধ্যে, ওর ডাক্তারি জ্ঞানের মধ্যে যতরকম জানা আছে, তার প্রায় সবরকম রিপোর্টই দেখতে পেল। কিছুই বাদ নেই। মাথা থেকে পা অবধি যা যা রিপোর্ট সম্ভব, তার প্রায় প্রত্যেকটাই ওই কাগজগুলোর ভিতর উপস্থিত। তার মধ্যে থেকেই হাল আমলে করা কয়েকটা

রিপোর্ট নিয়ে দেখতে থাকল দীপ্ত। তারপর মহীনবাবুকে ভালো করে পরীক্ষা করল।

"তেমন তো কিছু সমস্যা আমার মনে হচ্ছে না। আপনার যা যা রিপোর্ট আছে, তার সবগুলোই তো প্রায় ঠিক আছে দেখছি," দীপ্ত বলল।

"হে হে। এটাই তো স্যার! জানতাম এটাই বলবেন, সবকিছু নর্ম্যাল আছে। তা নাহয় মানলাম, কিন্তু আমার সমস্যাটা তো কমছে না। কিছুতেই পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছি না। মনটাই খারাপ হয়ে যায় মাঝে মধ্যে," মহীনবাবু বললেন।

"না না। মন খারাপ করার কী আছে? আচ্ছা, আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দিলাম, খেয়ে দেখুন কিছুদিন। এই মুহূর্তে আর কিছু রিপোর্ট করার নেই। সবই তো করা আছে রিসেন্টলি। আপনি দু'সপ্তাহ পরে আবার আসুন," দীপ্ত বলল।

"তবুও স্যার, আপনি আরেকবার রিপোর্ট করতে দিন। আমি একবারে করেই নিয়ে আসব।"

"এখন করার কোনও দরকার নেই। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই বলব। আপনি বড্ড চিন্তা করেন দেখছি। রোগ নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না, রোগ মাথায় চেপে বসবে," দীপ্ত মজার ছলে বলল।

"কোনও চিন্তাই নেই আমার। বাট শরীরটা ঠিক সাথ দিচ্ছে না। মানে, ফুল ফিট হচ্ছি না কিছুতেই। আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আমার কি ক্যান্সার হতে পারে? লক্ষণ দেখে কী বুঝছেন?" ভদ্রলোক বড্ড কৌতূহলী।

"আপনি এসব কেন ভাবছেন?"

দীপ্ত এতক্ষণে মোটামুটি বুঝে ফেলেছে ওঁর রোগটা কী। খুব কমন একটা রোগ। হাসপাতালের আউটডোরে, ডাক্তারদের চেম্বারে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসেন এই ধরনের রোগীরা। রকমারি উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের কাছে হাজির হন। কিন্তু পরীক্ষা করে কখনওই অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় না। এঁরা তবুও আসেন; আসতেই থাকেন। বছরের পর বছর একই উপসর্গ নিয়ে এঁরা ডাক্তারবাবুদের শরণাপন্ন হন।

"আসলে স্যার, আমার মামার এক বন্ধু ক্যান্সারে মারা গেল কিছুদিন আগে। সেম টু সেম আমার মতো সিম্পটম। তাই ভয় ভয় লাগে। মরে টরে যাব না তো?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি বৃথা এত ভয় পাচ্ছেন। যে ওষুধগুলো লিখে দিলাম সেগুলো আগে খান। তারপরে আসবেন, দু'সপ্তাহ পরে," দীপ্ত বলল।

"একটা অনুরোধ আছে স্যার। কিছু টেস্ট লিখে দিন, করিয়ে নিই আরেকবার। আমার মনটা শান্ত হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে আপনার যদি মনের শান্তি হয়, তাহলে লিখে দিচ্ছি। আপনার পয়সা বেশি হলে করিয়ে নেবেন।" অগত্যা কিছু টেস্ট লিখে দিল দীপ্ত।